দ্যূতক্রীড়ক : কারুবাসনার ঘুঁটি

অর্পণ চক্রবর্তী

ব্রাত্য বসুর প্রধান পরিচয় নট ও নাটককার। সেভাবেই তিনি সমধিক বিখ্যাত। কোনও নাটককার যখন উপন্যাস বা গল্প লেখেন, গদ্যের জগতে নিজেকে বিস্তৃত করতে চান তখন তা আগ্রহোদ্দীপক হয়ে ওঠে। ব্রাত্য যখন উপন্যাস লেখার জগতে পা বাড়ান খুব সাবলীল এবং অনিবার্যভাবে তাঁর বিষয় হয়ে ওঠে নাটকের জগৎ। ব্রাত্যর প্রথম উপন্যাস 'অদামৃতকথা' তাই লেখা হয় অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি এবং অমৃতলাল বসুকে নিয়ে। আর তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস শিশিরকুমার ভাদুড়িকে কেন্দ্রে রেখে সেই সময়ের স্বাধীনতা-পূর্ব বাংলা থিয়েটারের জগতের নানান অলিগলি এবং রাজপথকে উন্মোচিত করে। একটি জীবনীমূলক উপন্যাসের ধাঁচা ব্যবহার করে বাঙালি পাঠককে তিনি দাঁড় করান অনতি-অতীতের বাংলার সাংস্কৃতিক এবং একইসঙ্গে কলকাতা শহরের সামাজিক অর্থনৈতিক ইতিহাসের সামনে।

উপন্যাসটির নাম দ্যূতক্রীড়ক অর্থাৎ জুয়াড়ি। এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র শিশিরকুমার ভাদুড়ি। দ্যূতক্রীড়ক শব্দটির মানে হল বাজি রেখে যে পাশা খেলে। শব্দটি সংস্কৃত শব্দ। আমাদের দীর্ঘ অতীতের যে ইতিহাস সেখানে এই পাশা খেলা বা দ্যূতক্রীড়ার অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। ঋকবেদের সূক্তেও আছে অক্ষক্রীড়ার কথা। সেখানে ওই অক্ষক্রীড়ারত ব্যক্তিটির বয়ানে এই সাবধানবাণী উচ্চারিত হয় :

''জুয়া খেলিও না, চাষবাস কর। নিজের যেটুকু সম্পত্তি আছে যথেষ্ট মনে করিয়া (তাহাতে) খুশি থাক।''

ওই সূক্তেই আছে জুয়ার ঘুঁটি নিয়ে জুয়াড়ির খেদোক্তি : ''ইহারা নীচে গড়ায়, উপরে চড়ে। হাত নাই (ইহাদের, তবুও) যাহার হাত আছে তাহাকে পরাভূত করে। (ইহারা যেন) জুয়ার পাটায় নিক্ষিপ্ত দৈব অগ্নিপিণ্ড, (স্পর্শে) শীতল হইয়াও হৃদয়কে দগ্ধ করে।'' (উপরের দুটি অংশের অনুবাদই সুকুমার সেনের ''ভারতীয়-আর্য সাহিত্যের ইতিহাস'' বইটি থেকে নেওয়া।) আবার মহাভারতে দেখব দু'জন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র দ্যূতক্রীড়ারত। একজন রাজা নল আর একজন যুধিষ্ঠির। দু'জনেই রাজা, দু'জনেই এই দ্যূতক্রীড়ায় আসক্তিতে তাঁদের রাজত্ব, প্রতিষ্ঠা হারিয়েছিলেন।

যে জুয়াড়ি সে আসলে মনস্তত্ত্বগতভাবেই পরীক্ষাধর্মী এবং একইসঙ্গে আশাবাদী। যে জুয়াড়ি সে হারলেও আরও একবার দান ধরে তার কারণ সে পরীক্ষা করতে চায় সময়কে, সে নিরীক্ষণ করতে চায় মুহূর্তকে। অর্থাৎ প্রতিটি পরীক্ষা, প্রতিটি পরবর্তী দান তাকে এক অর্থে আশাবাদী প্রমাণিত করে। কিন্তু জুয়াড়িদের মধ্যে পার্থক্য ঘটে যায় তাদের চাওয়ায়। শুধু অর্থ এবং সমৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষায় যে-জুয়াড়ি জুয়াতে নিমজ্জিত থাকে, তার চরিত্র আলাদা আর এই পার্থিব সমৃদ্ধির অতিরিক্ত কোনও বিমূর্ত কিছুর প্রাপ্তির ধারণা যার থাকে সেই জুয়াড়ি পৃথক।

যুধিষ্ঠির বা নল কোনও সম্পদ প্রাপ্তির আশায়, কোনও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির আশায় দ্যুতক্রীড়ায় রত হননি। তাঁরা সময়ের সামনে, সময়ের চলনের সামনে দাঁড়িয়ে ভাগ্য নামক একটি বিমূর্ত ধারণার মুখোমুখি হতে চেয়েছিলেন — এই অর্থে তাঁরা পুরুষার্থকে একান্ত সম্বল করেছিলেন।

'দ্যুতক্রীড়ক' উপন্যাসে শিশিরকুমার ভাদুড়ি যুধিষ্ঠির / নল এবং সাধারণ জুয়াড়ির মাঝামাঝি একটি অবস্থানে যেন চিহ্নিত হয়ে থাকেন। তিনি তাঁর সমসময়ের সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক সামাজিক বিরোধিতার সামনাসামনি দাঁড়িয়ে নতুন শিল্পভাবনা, নতুন নাট্য দর্শকে প্রতিষ্ঠিত করার ঝুঁকি নিতে থাকেন অথচ সাধারণ জুয়াড়ির মতো শুধু অর্থই তাঁর মূল লক্ষ্য থাকে না। মূল লক্ষ্য থাকে খ্যাতি, যশ — যা এই দুই মেরুর মধ্যবর্তী একটি অবস্থানে তাঁকে নির্দিষ্ট করে।

ব্রাত্য বসু নিজে নাটককার, নট এবং নির্দেশক। তিনি জানেন বাংলা থিয়েটারকে বরাবর, এমনকি তাঁর সময়েও, কী ধরনের প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে চলতে হয়েছে, চলতে হয়। শিশিরকুমার ভাদুড়িকে তিনি একই সঙ্গে অধ্যাপক এস কে বি এবং নাটককার নট — এই দুই আইডেন্টিটির মধ্যে ফেলে নিরীক্ষারত।

এবং ব্রাত্য একথাও জানেন তিনি শুধুমাত্র একটি বিশেষ সময়ের ইতিহাস লিখছেন না, লিখছেন এক ব্যক্তির ইতিহাস, এক ব্যক্তির মনোজগতের ইতিহাস এবং সেই সূত্রে তিনি জীবন্ত করে তুলছেন একটি সময়খণ্ডকে।

আবার ব্রাত্য যেহেতু, মূলত এবং প্রাথমিকভাবে নাট্যব্যক্তিত্ব, ফলে তাঁর কাহিনির গঠনে যে সাসপেন্স থাকবে, যা আগ্রহী করে তুলবে কৌতূহলী করে তুলবে পাঠককে পরের লাইনটি পড়ার জন্য, এ কথা বাহুল্য।

এই উপন্যাস শুরু হয় এক দুপুরবেলায়। কলকাতা শহরের সুকিয়া রো-র বাড়িতে বসে বসে পড়াশোনা করেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় — পরবর্তীতে যিনি বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ হয়ে উঠবেন, তাঁর চিন্তাসূত্রে গ্রথিত হয়; ওই অঞ্চলের অনেক মাঠ আর পুকুর, মহেশ ঘোষের গোয়াল, গরু বিক্রির টাকায় তৈরি বিশাল শিবমন্দির, উত্তম মুদির দোকান, চিত্ত বামুনের মুড়ি মুড়কির দোকান, ইদানিং ক্রমবর্ধমান পশ্চিমা লোহালক্কড়ওয়ালাদের গুদাম আর গদি, এই প্রথম সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো কলকাতার ফুটপাথ। আর আপাতদৃষ্টিতে খুব তুচ্ছ এসবের বিবরণের মধ্যে দিয়ে সেই সময়কার কলকাতা শহরের একটি ভৌগোলিক অর্থনৈতিক সামাজিক ছবি তৈরি হয়ে উঠতে থাকে।

সেই ভূগোল ছিঁড়ে ছিঁড়ে একজন লোক আসছে; উপন্যাসের শুরুতেই যে আসবে একটি আসন্ন মৃত্যুসংবাদ নিয়ে। ডাক্তার অঘোরনাথ ঘোষ নিয়ে আসবেন তাঁদের বন্ধু শিশিরের বউয়ের আত্মহত্যার খবর। একটি মৃত্যু দিয়ে শুরু হচ্ছে একটি জীবনীমলূক উপন্যাস।

শিশিরকুমার ভাদুড়ি একটি আসন্ন অনিবার্য মৃত্যুর সংবাদের মধ্য দিয়ে এ উপন্যাসে প্রবেশ করেন আর উপন্যাস শেষ হয় আরব সাগরের উপরে টাম্পা নামক জাহাজের ডেকে। সেখানে মৃত বাবার সঙ্গে একটি কাল্পনিক কথোপকথন চলতে থাকে শিশিরকুমারের — যিনি ফিরে আসছেন আমেরিকা থেকে একটি প্রায় নিষ্ফল নাট্য অভিযান সেরে, আপাতত ব্যর্থ এক জুয়াড়ির মত। "দ্যুতক্রীড়ক" এমত সম্ভাবনাতে শেষ হয় যেন জীবনের পরের পর্বেও তিনি অন্তর্গত কারুবাসনার ডাকে মধ্যবিত্ত যাপনের নিশ্চয়তা পরিহার করে আবার শিল্পী জীবনের অনিশ্চিত সাফল্যের দিকে নিয়তিতাড়িত হয়ে উঠবেন।

আপাতত আমরা দেখব উপন্যাসের শুরুতেই ব্রাত্য সেই সময়ের কলকাতার রাস্তাঘাট বাড়ি দোকান এসবের ডিটেইল্‌ড্ বর্ণনায় পাঠককে সুকৌশলে যেন সশরীরে নিয়ে গিয়ে ফেলেন সেই স্পেসে।

উপন্যাসের প্রথম অধ্যায়ে শিশিরকুমারের স্ত্রীর আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যার প্রচেষ্টা এবং আসন্ন ও অনিবার্য মৃত্যুর সংবাদ আসার পর সুনীতি চট্টোপাধ্যায় স্মৃতিরোমন্থন করতে থাকেন তাঁর কলেজ জীবনের। ছাত্রাবস্থায় শিশিরকুমার ভাদুড়ির অভিনেতা হিসেবে প্রতিভার প্রাথমিক পরিচয় এখানে উন্মোচিত হয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এবং শিশিরকুমারের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে। প্রথম অধ্যায় শেষ হয় যখন সুনীতির চিন্তাস্রোত থমকে যায় — ‘‘তাদের ফিটন গাড়ি একটা হেঁচকি তুলে শিশিরদের যুগীপাড়া লেনের দোতলা ভাড়াবাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল। এখনও বিকেলের পর্যাপ্ত আলো আছে।’’

উপন্যাসের দ্বিতীয় অধ্যায়ে শিশিরের শৈশব-কৈশোর-দাম্পত্যজীবন এবং তাঁর প্রবাসী পিতা হরিদাস ভাদুড়ির সদাজাগ্রত আত্মমর্যাদাবোধ আর তীব্র ক্রোধের যে গল্প — সে সবের মধ্যে দিয়ে ব্রাত্য দ্রুত ও অভ্রান্তভাবে নাট্যব্যক্তিত্ব শিশিরকুমার ভাদুড়ির ভবিষ্যত মনোঃপ্রকৃতির উন্মোচন ঘটাতে থাকেন।

এই যে বাল্যকাল থেকে শিশিরকুমারের বড় হওয়ার বিবরণ এবং তাঁর পিতার প্রবাস থেকে মাঝে মাঝে ফিরে আসা; এ যেন অনেক সময় অপু ও কাজলের কথা মনে করিয়ে দেয়। কাজল তার মামার বাড়িতে, আর অপু ফিরে আসছে ছেলে কাজলকে দেখার জন্য — এই ছবিটি ভেসে উঠতে থাকে, এই-ই বোধহয় উপন্যাসের উত্তরাধিকার। উপনিবেশের মধ্যবিত্ত মানুষকে জীবিকার জন্যে, শিক্ষার জন্যে প্রবাসী হতে হয়, আবার ফিরে ফিরে আসতে হয়, শিকড়ের কাছে।

এখানে উপন্যাসের খানিকটা উদ্ধারযোগ্য :

> ‘‘মেদিনীপুর শহরেই তাই বড় হওয়া শিশিরের। দুপুরের দিকে সে আর ফণী প্রায়ই চলে যেত শহরের বাইরে কর্ণগড়ের ভাঙা রাজপ্রাসাদে। দু’জনে ঘুরে বেড়াত সেখানে আর দেখত ভাঙা উঁচু পাঁচিল, ভেঙে পড়া রাজবাড়ির খিলান, সেনাদের ধ্বসে পড়া ছাউনি, দেবদেবীর ভগ্নমন্দির আর আশেপাশে ঘন জঙ্গল, সেইসঙ্গে অজস্র মজে আসা বিশাল বিশাল দীঘি। কত ছায়াঘেরা দুপুরে কর্ণগড়ের ওই ভাঙা রাজবাড়ির ভেতরে ঘুরে বেড়িয়েছে শিশির আর ফণী। মহামায়া মন্দিরের ওই ভাঙা পাথুরে সিঁড়ি, শীর্ণ পারাং নদীর চিকচিকে জলে ঘুরে বেড়ানো ছোট ছোট তেচোখো মাছ, দীঘির জলে অলসভাবে ঢেউ চলে যাওয়া দীর্ঘ রঙিন ঢোঁড়াসাপ, পাশে বুনো ঝোপ ও প্রাসাদের বাইরে পাথরের ছাল বার করা লাল ইটের দেউল, শরৎকালে অলিগঞ্জের মাঠে উপচে পড়া কাশফুল, জর্জকোর্টের কেরানিটোলার বড় গির্জা, গির্জার ভেতর থেকে ভেসে আসা ভারী ঘণ্টার গম্ভীর আওয়াজ, দূর থেকে সিটি দিতে দিতে চলে যাওয়া কয়লার গুঁড়ো ওড়ানো লোকাল ট্রেন, খাপ্রেলবাজারের ভেতর তার দাদুর হাতের তৈরি ছোট স্কুল, একগম্বুজবিশিষ্ট পীর লোহানির মসজিদ, দূর থেকে ভেসে আসা ঘুঘুপাখির ডাক, সব মিলিয়ে ছোটবেলাতেই অন্যরকম মন তৈরি হয়ে গেছিল শিশিরের। কতবার হয়েছে, একা একা ছ’-সাত বছরের শিশির চলে গেছে শহরের মধ্যে খানকা শরিফের মাজারে। উঁচু উঁচু গাছ, আর তলায় শান্ত সমাধি। দুই কবরের মাঝে ছায়ার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ত বালক শিশির। ঘুম ভেঙে গেলে উঠে বসে ভাবত কর্মসূত্রে অনেক দূরে বর্মায় থাকা তার পিতার অস্পষ্ট মুখের কথা। দিনের পর দিন নিজের বাবার সঙ্গে দেখা হত না তার। এরকম কতবার হয়েছে, ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে হরিদাসের গম্ভীর মুখ দেখেছে শিশির। স্বপ্নে বাবার সঙ্গে কথা বলত শিশির। তার মধ্যেই অবচেতন থেকে সচেতন মনে ক্রমে বাবার মুখ স্পষ্ট হয়ে উঠত, আর ঘুম ভেঙে যেত তার। এই শান্ত কবরের মাটির উঁচু ঢিপির ধারে বসে তখন চোখে জল আসত শিশিরের। ভাবত, আবার কবে যে সে তার রাগী যুবক বাবাকে দেখতে পাবে।

> তারপর সত্যিই সে একদিন বাবাকে দেখতে পেত। স্টেশনে নেমে দু'হাতে ব্যাগভর্তি বাজার নিয়ে সাঁওতাল পল্লি পেরিয়ে খড়ের ছাউনি আর মুরগির ইতস্তত চলে বেড়ানো, লাল কাঁকরের মোরামের পথ দিয়ে ধীরগতিতে হেঁটে তাঁর কর্নেলগোলার শ্বশুরবাড়িতে ফিরতেন হরিদাস। স্টেশনে টাঙা থাকলেও, হরিদাস হেঁটে আসতেই পছন্দ করতেন বেশি। স্টেশনে নেমে কিছু বাজার করা, সাঁওতালদের হাট থেকে পছন্দসই টুকিটাকি জিনিস কেনা ছিল হরিদাসের নৈমিত্তিক অভ্যাস। ... শিশির যেই তার গম্ভীর বাবাকে দেখতে পেত, সে তখন আনন্দে চেঁচিয়ে গলির মুখে বাবার দিকে দৌড়ে যাওয়ার বদলে, চুপ করে একটা লাজুক হাসি হেসে দাঁড়িয়ে থাকত। তার চোখ চিকচিক করত আনন্দে। হরিদাস এসে তাঁর বড়ছেলের দিকে একটু চোখ তুলে, চোখেই হেসে, ভেতরে ঢুকে যেতেন। বাবার পেছনে পেছনে শিশিরও বাড়িতে ঢুকত।"

কিন্তু শিশিরকুমার অপু বা কাজল নন। শিশির ভাদুড়ির চরিত্রটিকে ব্রাত্য এভাবেই ধরেন :

> "তার দাদামশায়ের থেকে সে যেমন সাহিত্যকে উদগ্রভাবে ভালোবাসার উত্তরাধিকার পেয়েছে, মা কমলেকামিনীর কাছ থেকে পেয়েছে অপরিমিত প্রাণশক্তি ও দায়িত্ববোধ, তেমনি তার সেই ছোটবেলায় কম দেখতে পাওয়া প্রবাসী পিতার থেকে তার রক্তে সে পেয়েছে এক উদাসীন নিষ্ক্রিয়তা ও সিনিসিজম। সেইসঙ্গে বন্য এক ক্রোধ।"

আর স্ত্রী উষার আত্মহত্যা যে শিশিরকুমারকে আরও একটি গভীর শিক্ষা দিয়ে গেল তার জন্যে উপন্যাসে নির্মিত হয় একটি তুঙ্গ মুহূর্ত। তখনও উষার মৃত্যু হয়নি, দোতলার ঘরে মৃত্যুকালীন জবানবন্দি দিচ্ছে সে — যে, স্বামী তাকে অবহেলা করে, ভালবাসে না এই ভুল ধারণার বশে, নিজেই নিজের গায়ে আগুন লাগিয়েছে সে, তার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। ঠিক এ সময় নিচের ঘরে সুনীতিকে দেখে শান্ত গলায় বলছেন শিশিরকুমার : 'এসেছিস? মেয়েদের সম্বন্ধে কখনও উদাসীন হোস নে সুনীতি'।

এই মৃত্যু শিশিরকুমার ভাদুড়ির জীবনের একটি টার্নিং পয়েন্ট। লেখক অন্তত সেভাবেই এবং সার্থকভাবেই সেই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন উপন্যাসে। উষার আত্মহত্যার ঘটনাটি ঘটে ২৮ মে ১৯১৬। সেই রাতে নিমতলা ঘাট থেকে সৎকার শেষে ফেরার পরে সুনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে ব্রাত্য লিখছেন :

> "শিশিরদের খাটের দিকে তার চোখ গেল।...সেই মানুষটা কাল রাতেও এই খাটে, ফুলের নকশা করা এই বিছানার চাদরের ওপরে শুয়েছে। কত হাসি কত মান অভিমান, কত অনুরাগপূর্ণ ঘনিষ্ঠ মুহূর্ত, কত উৎকণ্ঠা-উদ্বেগ এমনকি কলহ পর্যন্ত এই নীরব বৃহৎ খাটটি চোখ মেলে দেখেছে । সবই আজ অতীত হয়ে গেল।...পুরোটা ভাবতে গিয়ে ঘোরের মত ঠেকছিল সুনীতির। যেন কিছুই হয়নি। বাইরের পৃথিবীর মতই এই ঘরটিও যেন সচল ও নির্বিকার হয়ে আছে। যেন কিছুই ঘটেনি গত ১২ ঘণ্টায় এই ঘরে।"

এই বয়ান আমাদের মনে করিয়ে দেয় এর ঠিক বছর নয়েক আগে ১৯০৭ সালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পুত্র শমীর মৃত্যুর পরে চিঠিতে লিখবেন : "শমী যে রাত্রে গেল তার পরের রাত্রে রেলে আসতে আসতে দেখলুম জ্যোৎস্নায় আকাশ ভেসে যাচ্ছে, কোথাও কিছু কম পড়েছে তার লক্ষণ নেই। মন বললে কম পড়েনি — সমস্তর মধ্যে সবই রয়ে গেছে, আমিও তারই মধ্যে।" এরপরেও লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ "সমস্তর জন্যে আমার কাজও বাকি রইল। যতদিন আছি সেই কাজের ধারা চলতে থাকবে।"

শোকের মধ্যেও কাজের ধারায় নিজেকে অবিচ্ছিন্ন করে রাখা, জাতশিল্পীদের এই মনোভঙ্গি সুনীতিকুমারের দৃষ্টিকোণে নয়, শিশিরকুমারের বয়ানেই সেই কারুবাসনার কথা উঠে আসবে পরে। তার আগে শিশিরকুমারের প্রথম দিককার অভিনয় জীবন, স্ত্রীর সঙ্গে রোমান্স-ঝগড়া, আত্মহত্যার পুঙ্খানপুঙ্খ

একটি বর্ণনার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে পাঠককে। তারপরে তৃতীয় অধ্যায়ের শেষে এ উপন্যাসের ভরকেন্দ্রটি উন্মোচিত হবে : সেদিন অনেক রাতে সুনীতির দু'হাত ধরে শিশির বলেছিল, "আমার জীবনের যাবতীয় ভুল কাজ করবার পরে তা এক বিষম অভিশাপ হয়ে বারবার আমার কাছে ফেরত এসেছে। আমি বারবার এক কানা গলির মুখে এসে দাঁড়িয়েছি। সেখান থেকে কী করে ফেরত যেতে হবে, তা আমি ভালো করে বুঝতেও পারিনি। বৃদ্ধ এক উন্মাদের মতো লেগেছে নিজেকে তখন। শুধু এক কারুবাসনার অদম্য তাগিদ আমাকে বারবার আবার স্বাভাবিক হৃদয়ে, স্বাভাবিক মস্তিষ্কে ফেরত এনেছে। তুই বিশ্বাস কর সুনীতি, আমি আর থিয়েটার করতে চাই না, অভিনয় করতে চাই না, কারুনির্মাণ করতে চাই না, কিন্তু আমার কোনো উপায় নেই। আমি ছাড়তে চাইলেও কারুবাসনা আমাকে ছাড়ে না। সে বারবার তার অলৌকিক সংকেত পাঠায় আমাকে। আমিও এক বুনো ক্ষ্যাপার মতো মেতে উঠি। যে জীবনে এসে আজ আমি দাঁড়ালাম, জানি না আমার ভবিষ্যতে কী আছে। আমি আন্দাজ করতে চাইলেও, তার তল খুঁজে পাব না জানি। শুধু এটুকু জানি, আমি অভিশপ্ত। এই বাসনা আমার সর্বাঙ্গে তার অভিশাপ লেপে দিয়েছে। এর থেকে এ জীবনে আর আমি বেরোতে পারব না"।

চতুর্থ অধ্যায়ে শিশিরকুমার হয়ে উঠেছেন মেট্রোপলিটন কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক এস কে বি। সে সময়ের কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের তথা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও ক্ষমতালুব্ধতার ইতিহাসের মধ্যে দিয়ে অধ্যাপক এস কে বি-কে পথ হাঁটান ব্রাত্য। নিরাপত্তাহীনতার বোধকে উপলব্ধি করানোর জন্য এস কে বি-র এই অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যাত্রার প্রয়োজন ছিল।

রবীন্দ্রনাথ ও স্যার আশুতোষের শীতল সম্পর্ক, আশুতোষ-পন্থী দীনেশচন্দ্র সেনের রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে তিক্ত মনোভাবের কারণে তাঁকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রিডারের পদ দান, প্রতিদানে দীনেশচন্দ্র সেনের ম্যাট্রিকের বাংলা প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের সম্মানহানির চেষ্টা — এসবই বিশদে উঠে আসতে থাকবে এ উপন্যাসে :

> "ছ'বছর আগের ম্যাট্রিকের পরীক্ষায় আসা প্রশ্নটি মেট্রোপলিটন কলেজের স্টাফরুমে বসে নিজের চোখে দেখেছিল শিশির। দেখে শিউরে উঠেছিল সে। সেই প্রশ্নপত্রে লেখা ছিল "শুদ্ধ এবং মার্জিত বাংলায় পুনর্লিখন করো" — তলায় জ্বলজ্বল করছে রবীন্দ্রনাথ লিখিত একটি গদ্যাংশ, ... অর্থাৎ এই খারাপ গদ্যটিকে ছাত্রদের শুদ্ধ করে ভালো গদ্যে লিখতে বলা হয়েছে।"

একাডেমিক জগতেও ক্ষমতার কাছে পাণ্ডিত্যের নতজানু হওয়ার যে অভিজ্ঞতা শিশিরের হয় তাতে এস কে বি হয়ে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্তই নিতে হয় তাঁকে : "জীবনের এই ভয় এবং তা কী করে ব্যক্তির নিরাপত্তাহীনতায় পরিণত হয় শিশির তাকে আজকাল বুঝতে পারে। সে চাকরি ছাড়তে পারে না শুধুমাত্র এই কারণে। ছাড়লে থিয়েটারের জগতে কাদের হাতে গিয়ে সে পড়বে? আরো কোন ধূর্ত এবং বেদনাদায়ক মতলব, ওই জলদেশের তলায় চলে বেড়ানো হিংস্র লোকগুলোর মনে আছে, তা তো সে জানে না।"

শিশিরকুমারের নিয়তি যে তাঁর জন্য অন্য কোনও ভবিষ্যৎ নির্ধারিত করে রেখেছে সে ইঙ্গিত তো ব্রাত্য আগেই দিয়ে রেখেছিলেন আগের অধ্যায়ের শেষে। আর এই অধ্যায়ের শেষে তিনি অধ্যাপনার একঘেয়ে জীবন থেকে বেরিয়ে এসে নতুন কিছু করার প্রবল এক উত্তেজনা বোধ করবেন। নিস্তব্ধ রাতে তাঁর মনে পড়বে এক শীতের সন্ধেয় ফাঁকা বিডন স্ট্রীটে তক্তপোশে বসে গিরিশচন্দ্র বলছেন তাঁকে : "মনে রেখো ডাক্তার, উকিল, অধ্যাপক, সমাজ চায় বলে মানুষ এগুলো হয়। কিন্তু কেউ যখন শিল্পী

হয়, তখন সে সেটা নিজে চায় বলে হয়। ফলে সমাজ কী বলল, অত কানে নিও না বাপু।”

১৯২০ সালের সেই রাতের পরে শিশিরকুমারের জীবন নিয়ে জুয়া খেলার, স্থিতাবস্থা থেকে জঙ্গমতার শুরু। ব্রাত্য এ উপন্যাসে ইতিহাসের শুষ্ক তথ্য — যা হয়তো আপাতদৃষ্টিতে ‘শুষ্কং কাষ্ঠং’ ছিল তাকে যেন ‘নীরস তরুবর’ হিসেবে প্রত্যক্ষ করেন। রাস্তায় পড়ে থাকা শুকনো কাঠের টুকরোর মধ্যেও যে কোনও এক বৃক্ষের অতীত ইতিহাস লুকিয়ে আছে তাকে প্রকাশ্য করে তোলেন। তাই এ উপন্যাসে জামসেদজি ফ্রামজি ম্যাডান এবং তাঁর জামাই রুস্তমজি দোতিওয়ালার বাংলা রঙ্গমঞ্চে পুঁজি লাগানো, মিনার্ভা এবং কোহিনুরের মালিকানা নিয়ে সেই সময়ের থিয়েটার মালিকদের মামলা মোকদ্দমা, প্রতিনিয়ত আকচাআকচির রুদ্ধশ্বাস বিবরণের সঙ্গে অনিবার্যভাবে যুক্ত হয়ে পড়েন শিশিরকুমার। সর্বার্থেই দ্যূতক্রীড়ক হয়ে ওঠার পালা এবার তাঁর।

ম্যাডানদের কলকাতায় থিয়েটার জগতে একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার জন্যে প্রয়োজন ছিল একজন হিরোর। পুঁজি প্রতিভাকে খুঁজে বার করে নিজের স্বার্থেই তাকে ব্যবহার করতে চায়। ম্যাডানরা প্রস্তাব দিলেন শিশিরকুমারকে তাঁদের থিয়েটার কোম্পানিতে যোগ দিলে মাসিক এক হাজার টাকা দেওয়া হবে তাঁকে, শর্ত একটাই, অন্য কোনও চাকরি করা যাবে না। সে সময়ে তাঁর মাইনের দশগুণ বেশি অঙ্কের টাকার জন্য এ প্রস্তাব যেমন লোভনীয়, তেমনি শিশিরের শিল্পীসত্তার দিকটিও ব্রাত্য উন্মোচন করেন : ‘‘শিশির বুঝতে পারছেন, ভাগ্যদেবী তাঁকে এতদিনে একটা সংকেত পাঠিয়েছেন। এ প্রস্তাব যদি তিনি না নেন, তাহলে একজন ছাপোষা অধ্যাপক হয়েই সারা জীবন কাটিয়ে দিতে হবে। তাঁর ভেতরে যে উন্মত্ত শিল্পীটি এক অবাধ্য বুনো ঘোড়ার মতো সর্বক্ষণ ছুটে বেড়াচ্ছে, তার লাগাম টেনে ধুঁকতে থাকা এক ক্লান্ত সহিসের মতো এই আস্তাবলে মুমূর্ষুজীবন তাঁকে কাটিয়ে দিতে হবে। জীবন-সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে থাকা শিশিরকুমার গভীর রাত্রে নিজেকে বারবার তিনি কী করবেন, তা জিজ্ঞেস করলেন এবং প্রতিবারই তিনি অধ্যাপনার চাকরি ছাড়ার ব্যাপারে ইতিবাচক উত্তর পেলেন।”

এরপর নানা উত্থানপতন, সাফল্য ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে যাত্রা করবেন শিশির। তাঁর এই যাত্রাপথের নানা বাঁকে সঙ্গী হবেন হেমেন্দ্রকুমার রায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। শিশিরের থিয়েটার জীবনের গল্পে যুক্ত হয়ে পড়েন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, রবি ঠাকুর এবং সেই সময়ের আরও অনেক বিখ্যাত মানুষেরা। ব্রাত্য কাহিনিকে ছড়িয়ে দিতে থাকেন জালের মতো। তার মোহিনী আকর্ষণে ধরা পড়তে থাকে পাঠক।

ম্যাডানদের কর্নওয়ালিশ থিয়েটারে আলমগীর, রঘুবীর নাটকের সফল প্রযোজনার পরেও শিশির ম্যাডানদের সঙ্গে চুক্তি বাতিল করে আবার এক অনিশ্চিত জীবন বেছে নেন। আবার একটি মৃত্যু — বন্ধু সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যুর রাত্রে বন্ধুদের কাছে বলতে থাকেন তিনি : ‘‘আসলে আমাকে নেওয়ার পরেই ম্যাডানরা বুঝতে পেরে গেছিল, যে ধরনের থিয়েটার ওরা চালাতে চায়, আমি মোটেও তার সঙ্গে মানানসই নই। বরং খানিকটা বেয়াড়া। আমিও বুঝেছিলাম, যে থিয়েটার আমি করতে এসেছি, তা ম্যাডান কোম্পানীর বা নিছক কোনও বানিয়া থিয়েটার প্রতিষ্ঠানে সম্ভব নয়। আমার দরকার নিজস্ব থিয়েটার।”

এরপর নিজের সিনেমা কোম্পানি খোলা, সিনেমা তৈরি করা, সিনেমা ফ্লপ হওয়া; এক ঘোরতর আর্থিক অনিশ্চয়তার মধ্যেও আবার নতুন থিয়েটার খোলার জন্য শিশিরকুমারের যে উদ্যম এবং কর্মকাণ্ড সে ইতিহাসের পরিবেশনে ব্রাত্য একদিকে যেমন পুঙ্খানপুঙ্খ তথ্যনির্ভর, অন্যদিকে সেই ঘটনাপ্রবাহের নাটকীয়তা ব্যবহার করে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে রাখায় তুমুল সফল।

এই পর্বে শিশিরকুমারের জীবনের প্রেম ও যৌনতার দিকটিকে যখন উপন্যাসে নিয়ে আসবেন ব্রাত্য তখন চিত্তাকর্ষকভাবে শৃঙ্গারের একটি তুঙ্গ মুহূর্ত সৃষ্টির বদলে সঙ্গম পরবর্তী ক্রমশ স্তিমিত হওয়ার, রতির পরবর্তী বিরতির বর্ণনায় শিল্পীর জন্য নির্ধারিত অনিবার্য অতৃপ্তিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেন।

এভাবেই শুরু হয় নবম অধ্যায় :

> "নিজেকে জোর করে মহিলাটির শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করলেন তিনি। তারপর মহিলার পাশেই তিনি গড়িয়ে পড়লেন। স্খলনের পরে অত্যন্ত অবসন্ন লাগে তাঁর। শরীরী সংস্পর্শের সময় যেটুকু উত্তেজনা তা ধীরে ধীরে থিতিয়ে যায়। ওই সময়টুকু মাথায় কিছু কাজ করে না। তারপরেই রাজ্যের চিন্তা ভিড় করে আসে। আর এইসময় নিজের জীবনের আশ্চর্য গতি প্রকৃতি ভাবতে গিয়ে তিনি স্তব্ধ হয়ে যান। সেই শৈশব থেকে জীবন উত্তাল সমুদ্রে ফেলে টানতে টানতে কোথায় তাঁকে নিয়ে এল ইত্যাদি।"

স্ত্রী উষার পরে শিশিরকুমার এই যে-নারীর সঙ্গে গভীর সম্পর্কে জড়ালেন, তিনি কঙ্কাবতী সাহু — এক বিহারী জমিদারের অবৈধ সন্তান। বেথুন কলেজ থেকে বি এ পাশ করে তিনি তখন স্টার থিয়েটারের প্রবোধচন্দ্রের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ। তাঁকে শিশিরকুমার আরও বেশি অর্থের বিনিময়ে চুক্তিবদ্ধ করলেন নিজের নাট্যদল নাট্যমন্দিরের সঙ্গে। এই শিক্ষিতা নারীই তাঁর পরবর্তী জীবনে নানা ভাবে তাঁকে উদ্বুদ্ধ করবেন।

দশটি অধ্যায়ের এ উপন্যাসের শেষে আমেরিকায় শিশিরকুমারের নাটকের দল নিয়ে যাত্রা ও প্রায় নিষ্ফল হতাশ হয়ে ফিরে আসার যে তিক্ত কাহিনী, তার প্রতিটি বাঁকে বাঁকে কখনও শিশিরকুমারের আমেরিকা যাত্রা পণ্ড করার চক্রান্ত, কখনও আমেরিকার এজেন্টের বিশ্বাসঘাতকতা, আবার কখনও আমেরিকা প্রবাসী বাঙালিদের সাহায্যে কয়েকটি শো সফল হওয়ার গল্প।

শিশিরকুমারের সবথেকে বড় জুয়াতে বাজি রাখার ঘটনা এই অধ্যায়েই ঘটে। শিশিরকুমার আমেরিকায় যাওয়ার জন্যে যাঁদের বেছেছিলেন তাঁদের অধিকাংশই অ্যামেচার অভিনেতা, এমনকি এঁদের অনেকে কখনও মঞ্চেও ওঠেননি। কিন্তু যে সব অভিনেতা তাঁর সম্পর্কে মাৎসর্য পোষণ করে এসেছেন বা প্রকাশ্যে স্বীকৃতি দিতে চাননি তাঁর প্রতিভার, তাঁদের শিশিরকুমার আমেরিকায় এই নাট্য অভিযানে নিতে সম্মত হলেন না। সহধর্মিণী কঙ্কাবতীর যথোচিত নিষেধও শুনলেন না তিনি। এরই ফলপরিণতিতে আদতে অপেশাদার দলের সঙ্গে সমস্ত চুক্তি বাতিল করবে রুজভেল্ট কোম্পানি।

> "তাঁর জীবনে এখন বিশেষ যে 'হামারশিয়া'টি সক্রিয় হয়ে উঠল, তা হল টিপিক্যাল বাঙালি মধ্যবিত্ত এক 'গুমোর'। যে গুমোরকে অ্যাভারেজ মানুষ আত্মমর্যাদা বা আত্মসম্মান ইত্যাদি ভারী ভারী বা দামি দামি শব্দের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলতে এবং নিজেকে স্তোক দিতে বিশেষ পছন্দ করে। মধ্যবিত্তর যে মধ্যচিত্ততা থেকে নিজেকে এবং বাংলা থিয়েটারকে আজীবন দূরে রাখতে চাইতেন শিশিরকুমার, পাকাপাকি মঞ্চ খোয়ানোর বিনাশকালে মানসিক দ্যূতক্রীড়ার সেই অক্ষপাশ থেকে নিজেকে কিছুতেই মুক্ত রাখতে পারলেন না বড়োবাবু।"

কিন্তু এ উপন্যাস হতভাগ্য কোনও জীবনের নিজের ভাগ্যকে দোষারোপে শেষ নয়। ১লা মার্চ, ১৯৩১। শুক্লপক্ষের সন্ধের আকাশ। শান্ত সমুদ্র। করাচিগামী টাম্পা জাহাজের ডেকে স্তানিস্লাভস্কির 'মাই লাইফ ইন আর্ট' বইটি পড়তে পড়তে মৃত পিতাকে দেখবেন শিশির। চমৎকার তাৎপর্যগর্ভ কথোপকথনে শিশির বলবেন — "হ্যাঁ, আমি এইরকম জুয়াড়ি হয়েই বাঁচবো। আর ক্রমাগত তিন তাস ফেলে যাবো জীবনের মাটিতে। একদিন হয়তো ইস্কাবনের টেকা পাবো, আর একদিন হয়তো পাবো চিড়িতনের দুরি।

কিন্তু আমি ধাওয়া করে যাবো। ঘোড়ায় যখন উঠেই পড়েছি তখন শেষদিন পর্যন্ত ঘোড়াটাকে ছুটিয়ে যাবো।"

"দ্যূতক্রীড়ক" কিন্তু শিশিরকুমারের এই উদ্যম আর আশার সরলরৈখিকতাতে শেষ হয় না। ব্রাত্য নিজেই মৃত পিতা ও জীবিত পুত্রের এই কথোপকথনকে অন্তর্ঘাত করেন পিতা হরিদাসের সংলাপেই — "আমি গেলাম তবে। দয়া করে আর আমাকে এত ঘনঘন ডেকো না। আমার সঙ্গে কাল্পনিক কথোপকথনটাও এবার বন্ধ করো। যথেষ্ট বয়স হয়েছে তোমার। শিল্পচর্চা করে হাতির মাথা হবে। এসব বন্ধ করো। মৃত পিতার সঙ্গে এই অলীক সংলাপও।"

হরিদাস জলে ডাইভ দিয়ে মিশে যান সমুদ্রে। শিশিরকুমার উলোঝুলো চাদর কাঁধে নিয়ে কঙ্কাবতীর কেবিনের দিকে এগিয়ে যান।

আর উপন্যাসের লিখিত রূপটি শেষ হয় বটে এই বাক্যে : "ফাঁকা উন্মুক্ত আরব সাগর, একা তাঁদের নিঃসঙ্গ জাহাজটিকে কোলে নিয়ে নিঃশব্দে হাসতে লাগলো।" — কিন্তু সেটি অলিখিত আরেকটি কাহিনীর দিকে ক্রমাগত ভেসে যেতে থাকে।

অর্পণ চক্রবর্তী : কবি, প্রাবন্ধিক এবং মৌলানা আজাদ কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক।